মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?

সঞ্চারণ ডেস্ক

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাকার ও গ্রন্থ পরিচিতিঃ

বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। উপমহাদেশের গণ্ডী পেরিয়ে যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল আরব বিশ্বেও। তিনি ১৯১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই তাঁর হাত ছিল সিদ্ধহস্ত। তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রাক্তন রেক্টর এবং পাশাপাশি রাবেতা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি রাবেতা ফিকাহ কাউন্সিলের সদস্য এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের সেবার জন্য ১৯৮০ সালে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মাননা বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান সময়ের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ তারিক রমাদানের পিতা সাঈদ রমাদান (হাসান আল-বান্নার জামাতা) এর সাথেও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর উষ্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যা তারিক রমাদানের Islam, The West & The Challenges of Modernity বইটির ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক জগত ছাড়িয়ে তিনি মাঠ পর্যায়েও ছিলেন সদা তৎপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। মুসলিম সমাজে তো বটেই অমুসলিমদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী। ১৯৯৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর এই মহান মনীষী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু মুসলিম ভারতের এক ইতিহাসের সমাপ্তি এবং অদূর ভবিষ্যতেও এ শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়।

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ যা সর্বপ্রথম মিসরের এক অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বইটি ইংরেজীতে Islam and The World নামে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গত শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম মনীষী সাইয়েদ কুতুবের লিখিত ভূমিকায় বইটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। ২০০২ সনে এই মহামূল্যবান বইটি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।

বইটিতে মুসলিম বিশ্বের উত্থানের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের চিত্রায়ন মুসলিম মানসে ফিরিয়ে দেয় আত্মবিশ্বাস। অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে উন্নতির শীর্ষে মুসলিম বিশ্বের অবগাহন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মুসলিম বিশ্ব আজো ফুরিয়ে যায় নি। এই একবিংশ শতাব্দীতেও ইসলাম এনে দিতে পারে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সাফল্যের অপূর্ব সম্মিলন। কিন্তু সে পথ বন্ধুর, কণ্টকময়। পতনযুগের সার্বিক দিক বিবেচনা করে লেখক উচ্চারণ করেছেন এক সতর্কবাণী। সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী নিয়ে তিনি কি কেবল আধ্যাত্মিক ব্যর্থতার কথা-ই তুলে ধরেছেন? না, তা নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক তথা জ্ঞানের রাজ্যে মুসলিম বিশ্বের পশ্চাদপদতার দিকেও তিনি অংগুলি নির্দেশ করেছেন। এখানেই লেখক পরিসমাপ্তি ঘটাননি, সামরিক ক্ষেত্রে অদক্ষতাকে সমানভাবেই দায়ী করেছেন। বইটির পাতায় পাতায় পাঠক যেন অন্তরের এক গভীর ক্রন্দন খুঁজে পাবেন। তবে স্মৃতিকাতরতা আর সমালোচনা নয়, জীবনের ময়দানে মুসলিম বিশ্বকে নতুন প্রস্তুতির দিকে আহবান করে এক সুসংবদ্ধ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

> বইটি এতই আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রশিক্ষণী সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্টাডি সার্কেল ও ট্রেনিং সেশন থেকে শুরু করে জেলখানা পর্যন্ত এর প্রচার ও প্রসারের কাজ করা হয়। আদালতের বিতর্কে ও পার্লামেন্টের বক্তৃতায়ও এ বই থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। গত শতাব্দীর অন্যতম

মুসলিম মনীষী সাইয়েদ কুতুবের সাপ্তাহিক আলোচনায় বইয়ের সারসংক্ষেপ ও তার উপর আলোচনা-পর্যালোচনা হত। তরুণ সমাজকে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণে বইটি বিশেষভাবে সহায়ক।

রাসূল আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বেঃ

নবুয়াতের পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র বিশ্বের বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে এই লেখনীতে এক নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে। এইচ জি ওয়েলস্ ও রবার্ট ব্রিফল্ট এর মত উঁচু মাপের পশ্চিমা গবেষকদের সম্ভার থেকেই প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে প্রাক-ইসলামী যুগে ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্নতার কথা। ঐ সময়ে যৌন অরাজকতা, বর্ণবৈষম্য, নারীর অমর্যাদা আর মূর্তিপূজার মত মানব বিধ্বংসী কর্মকান্ডের প্রাদূর্ভাব লক্ষ করা যায়। আরব সমাজের অন্ধ গোত্রপ্রীতি আর যুদ্ধবিগ্রহ তৎকালীন সমাজে বিষফোঁড়ার মত কাজ করছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল নিরংকুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র যেখানে অত্যাচারী শাসকের নিকট সাধারন মানুষ ছিল বন্দী আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল বৈষম্যমূলক। বইটির প্রথম অধ্যায় ছিল মূলত এই সমস্ত বিষয়াবলীর প্রতি কেন্দ্রীভুত।

রাসূল আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পরঃ

এ অধ্যায়ে মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব এবং পূর্ববর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ হতে এক পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে উত্তরণের ধাপ সমূহ বর্ণিত হয়। এই অংশে লেখক এ উত্তরণকে এক পরিপূর্ণ সংস্কার হিসেবে উল্লেখ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এর নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং তাঁর প্রভাব কিভাবে তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে তা এখানে আলোচিত হয়েছে।

মুসলমানদের নেতৃত্বের যুগঃ

মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনে পরিপূর্ণ আসন গ্রহণ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে অবদানকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অংশে। মুসলমানদের এই অগ্রগতি পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেঁনেসাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে কিরুপ অবদান রেখেছে তা মুসলমানদের নেতৃত্বের যুগ পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। জীবন সম্পর্কে মুসলমানদের ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা আধুনিক সময়ে মুহাম্মদ আসাদের মত ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ইহুদী ব্যক্তিত্বকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তাও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মুসলমানদের পতন যুগঃ

এ অংশে মুসলমানদের পতন যুগ আলোচিত হয়েছে। মুসলমানদের এ পতনের উৎসমূল হিসেবে লেখক চিহ্নিত করেছেন জিহাদ ও ইজতিহাদের অভাবকে। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম শাসকদের নৈতিক অধঃপতন পরবর্তীতে রাজতন্ত্রের দিকে রূপ নেয়। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ধর্ম ও রাজনীতির যে বিভাজন শুরু হয় তা ইসলামকে তার দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়। গ্রন্থকার তৎকালীন সময়ের মুসলিম চিন্তানায়কদের অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অহেতুক মনোযোগ প্রদানকে পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অবহেলার পাত্র হিসেবে পরিগনিত হয়। গ্রীক দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব মুসলিম পন্ডিতদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। পাশাপাশি শিরক ও বিদআত এর আবির্ভাবে ইসলামের প্রাণশক্তি নির্জীব হয়ে পড়ে। অপরপ্রান্তে খ্রিষ্টান ইউরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে রত ছিল। কেননা মুসলমানরা গোটা প্রাচ্যের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল এবং খ্রিষ্টানদের সকল পবিত্র স্থাপনায় মুসলমানদের দখলে ছিল। কিন্তু মুসলমানদের পতনের যুগে তা আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করল। ক্রুসেডারদের এই অভিযানের পরিণতি ছিল খুবই ভয়াবহ। এই পতন যুগেও নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাউদ্দীন আইয়ুবীর মত নেতৃত্ব মুসলিম বিশ্বকে আরো কিছু সময়ের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। উত্তম চরিত্র, আল্লাহভীতি আর জিহাদী প্রেরণার সমন্বয়ে এই দুই মনীষী ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজয় বরণে বাধ্য করেন। তাঁদের অনুপম চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর জাযারী তাঁর “তারীফুল কামিল” নামক গ্রন্থে বলেন,

“আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশুনা করেছি। খুলাফায়ে রাশেদীন ও ওমর ইবনুল আবদুল আযীযের পর নুরুদ্দীনের চেয়ে অনুপম চরিত্রের অধিকারী ও তার চেয়ে অধিক ন্যায় বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি।”

কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় এসেছিল তারই হাতে গড়া ও প্রশিক্ষিত সুলতান সালাউদ্দিনের হাতে। বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করে তিনি মুসলমানদের সুদীর্ঘ ৯০ বছরের আকাংখা পূর্ণ করেন। সুলতান সালাউদ্দীনের অনুগ্রহের কথা ঐতিহাসিক লেনপুন এর ভাষায় উঠে এসেছে এভাবেঃ

সুলতান সালাউদ্দীনের সমস্ত গুনের ভেতর কেবল এই একটি গুনের কথা যদি দুনিয়া জানত; যদি জানতে পারত তিনি কিভাবে জেরুজালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত, সুলতান সালাউদ্দীন কেবল তার যুগের নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন।

কিন্তু সুলতান সালাউদ্দীনের পর মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব পুনরায় স্থবির হয়ে পড়ে। আর ঠিক এই সময়েই অত্যাচারীদের বন্য ও বর্বর আক্রমন সংগঠিত হয়। ৬৫৬ হিজরীতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে যা তৎকালীন বিশ্বের গৌরবজ্জ্বল ও জমজমাট শহরটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। পরবর্তীতে মিসরীয় সেনাবাহিনী তাতারীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। যদিও ততদিনে তাতারী আক্রমণের ফলে মুসলিম বিশ্বের চিন্তা ও শক্তিতে নির্জীবতা ও উদাসীনতা জন্ম নেয় যা হতাশা ও স্থবিরতায় রূপ নেয়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে উসমানীয় তুর্কীরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয় এবং একই সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বুকে রাজত্ব কায়েমে সক্ষম হয়। কিন্তু তুর্কীদের এ উত্থানও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এবং ধীরে ধীরে তাদের মাঝেও স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতা লক্ষ করা যায়।

মুসলিমদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত অধঃগতির যুগেও গ্রন্থকার বেশ কিছু নক্ষত্র তুলে এনেছেন তার গ্রন্থে যারা ছিলেন স্বমহিমায় ভাস্বর । এ সময় ইবনে খালদুনের মত মনীষী মুসলিম বিশ্বকে মুকাদ্দিমার ন্যায় গ্রন্থ উপহার দেন। উপমহাদেশের হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেছানী , হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, তার পুত্র শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী, হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলভী স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন যুগান্তকারী মনীষী। তুর্কীদের সমসাময়িক প্রাচ্য সমাজের দিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এ গ্রন্থে। ভারতবর্ষের মোঘল সম্রাজ্যের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর যিনি সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি, বিজয়ের আধিক্য, দীনদারী ও ধর্মীয় জ্ঞানবত্তারদিক দিয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী মোঘল বাদশাদের অযোগ্যতা ও দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

প্রাচ্য ভূখন্ডে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল ইরানের সম্রাজ্ঞীর হুকুমাত কিন্তু শী�আ মতবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও এর প্রতি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন এবং তুর্কীদের সংগে সংঘাত সংঘর্ষ তাকে সুস্থ মস্তিস্কে গঠনমূলক চিন্তার অবকাশ দেয়নি। খ্রিষ্টীয় ষষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দী ইউরোপের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই দীর্ঘ সময়টাতে ইউরোপ তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানে কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের মত মনীষীর আগমন ঘটে; পর্যটক ও নাবিকদের মধ্যে কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা, ও ম্যাগলিন এর মত উদ্দমী, সাহসী ও দৃঢ়বেত্তা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যারা অজানা অনেক দেশ আবিস্কার করেন।

বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য জগত ও তার ফলাফলঃ

পরবর্তী অধ্যায়ে নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য জগত ও তার ফলাফল আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাকার এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাগতের উৎসমূল নিরুপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা কোন স্বল্প বয়সী সভ্যতা নয় যার জন্ম বিগত কয়েক শতাব্দীতে হয়েছে। বরং এই সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক দর্শনকে পুঁজি করে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে। গ্রীক সভ্যতার বস্তুবাদী চিন্তা, ভোগবাদীতা এবং দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শনকে অনুপ্রাণিত করে। এরিস্টটলের নৈতিক বিধিব্যবস্থার শীর্ষে ছিল দেশপ্রেম যা গ্রীকদের জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারনাকে সমর্থন করে। রোম সভ্যতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল রাজতন্ত্র প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ও জীবন সম্পর্কে নির্ভেজাল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্ত পরবর্তীতে রোমকদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা যদিও তা পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্মকে মূর্তিপুজার মিশ্রণের দিকে ধাবিত করে। খ্রিষ্টধর্মের এই বিকৃত রূপ রোমকদের পতনরোধে সক্ষম ছিল না। তাই বিপরীতক্রমে জন্ম নিল বৈরাগ্যবাদ যা ছিল প্রকৃতি বিরোধী এবং এক প্রকার বিকৃতি। খ্রিস্ট একাদশ শতাব্দীতে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হয় এবং তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। পোপের বিস্তৃত ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্য, ধর্মগ্রন্থে সংযোজন, পরিমার্জন ও বিকৃতি সাধন এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত যার পরিণতি ছিল চার্চের অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা ধর্মের বিরুদ্ধে রেঁনেসাপন্থীদের বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত করে। বিজ্ঞানী ব্রুনো ও গ্যালিলিওর নির্মম

পরিণতি ছিল চার্চের অত্যাচারের প্রধান স্বাক্ষর। ইউরোপের রেঁনেসা জন্ম দিল এমন সব লেখক, সাহিত্যিক, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর যারা বস্তুবাদের শিঙ্গায় ফু দিলেন এবং জনগণের মনমস্তিস্কে বস্তুবাদের বীজ বপন করলেন। মেকিয়াভেলীর “ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা” এই দর্শন ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পায়। কার্লমার্কসের অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদ আর ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাব ছিল এ সময় অপরিসীম। একই সাথে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ছিল উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের অপ্রপ্রয়োগ বস্তুবাদের এই যুগে ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব থাকাকালে পৃথিবীর পারিভাষিক ক্ষয়ক্ষতিঃ

পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব থাকাকালে পৃথিবীর পারিভাষিক ক্ষয়ক্ষতি গ্রন্থকার এ অধ্যায়ে ফুটিয়ে তোলেন। ধর্মীয় অনুভূতির অভাব ও নৈতিক অধঃপতনকে তিনি বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করেন। কিন্তু এর মাঝেও গ্রন্থকার উপমহাদেশের অনেক সুলতান ও আলেমের জীবন পর্যালোচনা করেন যা ছিল পতন যুগে অকল্পনীয়।

জীবনের ময়দানে মুসলিম বিশ্বঃ

জীবনের ময়দানে মুসলিম বিশ্বের আলোচনায় নেতৃত্বের অভাবকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। গ্রন্থকার এখানে অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি ও চেতনাবোধের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। শিল্প-প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের আহবান জানিয়েছেন।

আরব বিশ্বের নেতৃত্বঃ

সর্বশেষ আরব বিশ্বের নেতৃত্ব গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। আরব বিশ্বের ভৌগলিক গুরুত্বের উপর তিনি খুব জোর দিয়েছেন। পার্থিব লালসা থেকে মুক্ত হয়ে মানবতার মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহন করার আহবান জানিয়েছেন মহান দার্শনিক ইকবালের কবিতার মাধ্যমে -

“কাবার নির্মাতা তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠো ফের

হাতে তুলে নাও ফের দায়িত্ব গড়া এ বিশ্বের।”

সঞ্চারণ ডেস্ক